ফেলুদা সমগ্র

# সমাদ্দারের চাবি

সত্যজিৎ রায়

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গলিইবুক.কম
bengaliebook.com

# সূচিপত্র


- সমাদ্দারের চাবি – ১ ....................2
- সমাদ্দারের চাবি – ২ ....................10
- সমাদ্দারের চাবি – ৩ ....................21
- সমাদ্দারের চাবি – ৪ ....................26
- সমাদ্দারের চাবি – ৫ ....................32

# সমাদ্দারের চাবি – ১

ফেলুদা বলল, ‘ এই যে গাছপালা মাঠবন দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, এর বৈজ্ঞানিক কারণটা কী জানিস? কারণ, আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সঙ্গে মানুষের চোখের একটু স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমে শহর থেকে লোপাট হতে চলেছে, তাই শহর ছেড়ে বেরোলেই চোখটা আরাম পায়, আর তার ফলে মনটাও হালকা হয়ে ওঠে। যত চোখের ব্যারাম দেখবি শহরে। পাড়াগাঁয়ে যা, কি পাহাড়ে যা, দেখবি চশমা খুঁজে পাওয়া ভার।’

আমি জানি ফেলুদার নিজের চোখ খুব ভাল, তার চশমা লাগে না, সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে, যদিও সে কোনওদিন গ্রামে-টামে থাকেনি। এটা ওকে বলতে পারতাম, কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না। আমাদের সঙ্গে মণিবাবু রয়েছেন, মণিমোহন সমাদ্দার, তাঁর চোখে পুরু মাইনাস পাওয়ারের চশমা। তিনিও অবিশ্যি শহরের লোক। বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, বেশ ফরসা রং, নাকটা যাকে বলে টিকোলো, কানের কাছে চুলগুলো পাকা। মণিমোহনবাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামুনগাছি। কেন যাচ্ছি সেটা এই বেলা বলা দরকার।

গতকাল ছিল রবিবার। পুজোর ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে। আমরা দুজনে আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি। আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতায় বিজ্ঞাপন দেখছি, আর ফেলুদা একটা সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে বই খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে। আমি লক্ষ করছি সে কখনও আপন মনে হেসে আর কখনও ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভাল লাগা আর অবাক হওয়াটা বোঝাচ্ছে। বইটা ডক্টর ম্যাট্রিক্স সম্বন্ধে। ফেলুদা বলছিল এই ডক্টর ম্যাট্রিক্সের মতে মানুষের জীবনে সংখ্যা বা নম্বর জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার

করে। অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পিছনেই নাকি খুঁজলে নানারকম নম্বরের খেলা আবিষ্কার করা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হত না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত। বলল, 'ডক্টর ম্যাট্রিক্সের একটা আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা শোন। আমেরিকার দুজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো?

'লিঙ্কন আর কেনেডি?'

'হ্যাঁ। আচ্ছ এই দুজনের নামে কটা করে অক্ষর?'

' L-I-N-C-O-L-N – সাত। K-E-N-N-E-O-Y – সাত।'

'বেশ। এখন শোন – লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হন ১৮৬০ সালে, আর কেনেডি হন ১৯৬০ সালে – ঠিক একশো বছর পরে। দুজনেই খুন হয় শুক্রবার। খুনের সময় দুজনেরই স্ত্রী পাশে ছিল। লিঙ্কন খুন হন থিয়েটারে; সে থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড ! কেনেডি খুন হন মোটর গাড়িতে। সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি গাড়ি। গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন। লিঙ্কনের পরে যিনি প্রেসিডেন্ট হন তাঁর নাম ছিল জনসন, অ্যানড্রু জনসন। কেনেডির পরে প্রেসিডেন্ট হন লিন্ডন জনসন। প্রথম জনের জন্ম ১৮০৮, দ্বিতীয় জনের জন্ম ১৯০৮ – ঠিক একশো বছর পর। লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস?'

'জানতাম, ভুলে গেছি।'

'জন উইল্‌ক্‌স বুথ। তার জন্ম ১৮৩৯ সালে। আর কেনেডিকে খুন করে লী হারভি অসওয়াল্‌ড। তার জন্ম ঠিক একশো বছর পরে – ১৯৩৯। এইবারে নাম দুটো আরেকবার লক্ষ কর। John Wilkes Booth — Lee Harvey Oswald – ক'টা অক্ষর আছে নামে?'

অক্ষর গুনে থ' হয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'দুটোতেই পনেরো?'

ফেলুদা হয়তো ডক্টর ম্যাট্রিক্সের তাজ্জব আবিষ্কারের বিষয়ে আরও কিছু বলত, কিন্তু ঠিক এই সময়ে বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হল মণিমোহন সমাদ্দার। ভদ্রলোক নিজের

পরিচয়-টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন, ‘আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি – লেক প্লেসে।’

ফেলুদা ও বলে চুপ করে গেল। আমি ভদ্রলোককে আড়চোখে দেখছি। গায়ে একটা হালকা রঙের বুশশার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট, পায়ে বাটার স্যান্ডাক জুতো। ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে গলা খাকরিয়ে বললেন, ‘আপনি হয়তো আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন, রাধারমণ সমাদ্দার।’

‘এই সেদিন যিনি মারা গেলেন?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল। ‘যাঁর খুব গান বাজনার শখ ছিল?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘অনেক বয়স হয়েছিল না?’

‘বিরাশি।’ –

‘ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে পড়ছিলাম। অবিশ্যি মৃত্যু সংবাদটা পড়ার আগে তাঁর নাম শুনেছিলাম বললে মিথ্যে বলা হবে।’

‘সেটা কিছুই আশ্চর্য না। উনি যখন গান বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ। প্রায় পনেরো বছর হল রিটায়ার করে বামুনগাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছিলেন। আঠারোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয়। সেইদিন রাত্রে মারা যান।’

‘আই সি।’

ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ড চুপ। ফেলুদা তার বা পা-টা ডান পায়ের উপর তুলে বসেছিল, এই ফাঁকে ডান পা-টা বা পায়ের উপরে তুলে দিল। মিস্টার সমাদ্দার একটু কিন্তু কিন্তু

ভাব করে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাবছেন লোকটা কী বলতে এল। আসলে ব্যাক-গ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে...।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' ফেলুদা বলে উঠল। 'আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। টেক ইওর টাইম।'

মণিমোহনবাবু বলতে লাগলেন, 'আমার কাকা ঠিক সাধারণ মানুষ ছিলেন না। ওঁর পেশা ছিল ওকালতি, এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট। বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান-বাজনার দিকে চলে যান। শুধু গাইতেন না, সাত-আট রকম

এবং এ ছাড়াও আরও কয়েকটা। তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল ! ওঁর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন।'

'কোন বাড়িতে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে থাকতেই শুরু হয়, তারপর সে সব যন্ত্র বামুনগাছির বাড়িতে নিয়ে যান। যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন। বম্বেতে একবার এক ইটালিয়ান জাহাজির কাছ থেকে একটা বেহালা কেনেন, সেট কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেন ত্রিশ হাজার টাকায়।'

ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল ইটালিতে প্রায় তিনশো বছর আগে দু-তিনজন লোক ছিল যাদের তৈরি বেহালার এমন কয়েকটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে সেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকায় পৌছে গেছে।

সমাদ্দার মশাই বলে চললেন, ' এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। এই যে শেষ বয়সে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, তার একটা প্রধান কারণ হল তাঁর কৃপণতা।'

'আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে?'

'এখন আর বিশেষ কেউ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয় কিছু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। আমার কাকার ছিলেন চার ভাই, দুই বোন। বোনেরা মারা গেছেন। ভাইয়ের মধ্যে কাকাকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন, আর একজন জীবিত কি মৃত জানা নেই। তিনি প্রায় ত্রিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান। রাধারমণ নিজে বিপত্নীক ছিলেন। একটি ছেলে ছিল, মুরলীধর, তিনিও প্রায় পচিশ বছর হল মারা গেছেন। তাঁর ছেলে ধরণীধর হল কাকার একমাত্র নাতি। ছেলেবেলায় সে কাকার খুবই প্রিয় ছিল। শেষটায় পড়াশুনোয় জলাঞ্জলি দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল, তখন থেকে কাকা আর তার মুখ দেখেননি। এই হল আত্মীয়।'

'ধরণীধর বেঁচে আছেন?

'হ্যাঁ। সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার দলে যোগ দিয়েছে। কাকার মৃত্যুর পর তার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু সে কলকাতায় নেই। দলের সঙ্গে কোনও অজ পাড়াগাঁয়ে ট্যুরে বেরিয়েছে। ওর বেশ নামটাম হয়েছে। গান বাজনাতেও ট্যালেন্ট ছিল, যে কারণে কাকা ওকে ভালবাসতেন।'

মণিমোহনবাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করলেন। তারপর আবার

বলে চললেন—

'আমার সঙ্গে কাকার যে খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয়। বড়জোর দুমাসে একবার দেখা হত। ইদানীং আরও কম। আসলে, আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে, ইউরেকা প্রেস, তাতে এই গত ক'মাস লোডশেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে। কাকার হার্ট অ্যাটাকটা হওয়াতে ওঁর প্রতিবেশী অবনীবাবু আমাকে টেলিফোন করে খবর দেন, আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বোসকে নিয়ে চলে যাই। যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না। মারা যাবার ঠিক আগে জ্ঞান হয়। আমাকে দেখে মনে হল চিনলেন। দু-একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন - ব্যস — তারপরেই শেষ।'

'কী বললেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। সে এখন আর পায়ের উপর পা তুলে নেই; চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে।

'প্রথমে বললেন – "আমার...নামে"। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে, কথা নেই। শেষে অনেক কষ্টে দুবার বললেন–"চাবি, চাবি..."'। ব্যস্।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে মণিমোহনবাবুর দিকে। বলল, 'কী বলতে চাচ্ছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন কি?'

'প্রথম অংশ শুনে মনে হয় ওঁর নামে যে কৃপণ বলে অপবাদ রটেছিল সেটার বিষয় কিছু বলতে চাইছেন। আমার ধারণা ওঁর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি৷ কীসের চাবির কথা বলছেন কিছুই বোঝা গেল না। ঘরে একটা থাকত। বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে, আর একটা বাথরুম, সেটা শোবার ঘরের সঙ্গে লাগ। আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছুই নেই। অন্তত চাবি লাগে এমন জিনিস তো নেই বললেই চলে। দরজায় যে তালা ব্যবহার করতেন, সেটা একরকম জামান তালা, তাতে চাবির দরকার হয় না, নম্বরের কম্বিনেশনে খুলতে হয়।'

'সিন্দুক আর আলমারিতে কী ছিল?'

'আলমারির তাকে কিছু জামা কাপড় ছিল, আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র। দরকারি কিছুই না। আর সিন্দুক ছিল একেবারে খাঁ খাঁ খালি।'

'টাকা পয়সা?'

' নাথিং। নট এ পাইস। টেবিলের দেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল, আর বালিশের নীচে একটা বটুয়াতে কিছু দুটাকা পাঁচ টাকার নোট। ব্যস্ ! বটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন। অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে।'

‘ কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য টাকা। সেটা ফুরিয়ে গেলে অন্য কোথাও থেকে বার করতে হত নিশ্চয়ই।’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না?’

মণিমোহনবাবু হেসে বললেন, ‘তাই যদি রাখবেন তা হলে আর সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাতটা হবে কোথায়? এককালে রাখতেন, তবে বছর পচিশেক আগে একটা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তারপর থেকে আর ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখেননি। অথচ –’ মণিবাবু গলার স্বর নামিয়ে নিলেন – ‘আমি জানি ওঁর বিস্তর টাকা ছিল। এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তাঁর দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশন। দেখলেই বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া উনি নিজের পিছনে বেশ ভালই খরচ করতেন। ভাল খেতেন, বাড়িতে ভাল বাগান করেছিলেন, একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন; মাঝে মাঝে বেরোতেন, শহরে আসতেন। কাজেই...’

ফেলুদা পকেট থেকে চারমিনার বার করেছে। মণিমোহনবাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল। ভদ্রলোক বেশ ভাল করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ‘এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি। এতগুলো টাকা – সব গেল কোথায়? কোন চাবির কথা বলছিলেন কাকু? সে চাবি দিয়ে কোন জিনিসটা খুললে কী পাওয়া যাবে? সেটা কি টাকা, না অন্য কিছু? যদি উইল থেকে থাকে তা হলে সেটা তো পাওয়া দরকার। উইল না থাকলে অবিশ্যি টাকা নাতিই পাবে, কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে। আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি। আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্‌প্ করতে পারেন!...’

মণিমোহনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল যে পরদিনই সকালে আমরা বামুনগাছি যাব। ওঁর গাড়ি আছে, উনি নিজেই সকাল সাতটায় এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবেন। আমি

বুঝেছি যে ফেলুদার কাছে এটা একটা নতুন ধরনের রহস্য। রহস্য না বলে হেঁয়ালিও বলা যেতে পারে।

অন্তত গোড়াতে তাই মনে হয়েছিল। শেষে দেখলাম হেঁয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোলমেলে প্যাঁচালো একটা কিছু।

# সমাদ্দারের চাবি – ২

বারাসত ছড়িয়ে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামুনগাছির দিকে গেছে। সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলিপি কিনে খাওয়ালেন। তাতে পনেরো মিনিট গেল, তা না হলে আমরা আটটার মধ্যেই বামুনগাছি পৌঁছে যেতাম।

গোলাপি রঙের পাঁচিল আর ইউক্যালিপটাস গাছে ঘেরা সাত বিঘে জমির উপর রাধারমণ সমাদ্দারের একতলা বাড়ি। যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধহয় মালী, কারণ তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল। গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভিতর একটা পুরনো কালো গাড়ি রয়েছে। সেটাই বুঝলাম রাধারমণ সমাদ্দারের অস্টিন।

গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে বাগানের দিকে ফিরে দেখি নীল হাফপ্যান্ট পরা আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাতে একটা এয়ারগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে। মণিমোহনবাবু তাকে বললেন, ‘তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? তাঁকে গিয়ে বলো তো যে মণিবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন, একবার ডাকছেন।’

ছেলেটি বন্দুকে ছররা ভরতে ভরতে চলে গেল। ফেলুদা বলল, ‘প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর বাবা অবনী সেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে। এখানে পাশেই ওঁর বাড়ি, তার সঙ্গে ওঁর নাসরি। মাঝে মাঝে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন।’

ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে। মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন, 'এ বাড়িটার যদ্দিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে। প্রায় ত্রিশ বছরের পুরনো চাকর। অনুকুল, এদের জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা করো তো।'

চাকর মাথা হেঁট করে হ্যাঁ বলে চলে গেল, আমরা তিনজন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম। দরজা দিয়ে ঢুকেই একটা খোলা জায়গা। সেটাকে ঘর বলা মুশকিল, কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাতিটাতিও নেই কারণ এদিকটায় ইলেকট্রিসিটিই নেই। আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে, মণিবাবু সেটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখুন, এই হল সেই জামান তালা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই কিনতে পাওয়া যেত। এর নাম হল এইট-টু-নাইন-ওয়ান।'

গোল তালা, তাতে চাবির গর্ত-টর্ত নেই, তার বদলে আছে চারটে খাঁজ। প্রত্যেকটা খাঁজের পাশে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা আছে, আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট হুকের মতো জিনিস বেরিয়ে আছে। এই হুকগুলোকে খাঁজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ঠেলে সরানো যায়, আর দরকার হলে যে-কোনও একটা নম্বরের পাশে বসিয়ে দেওয়া যায়। কোনটাকে কোন নম্বরে বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব।

মণিবাবু বা দিকের খাঁজ থেকে শুরু করে হুকগুলোকে পর পর ৮, ২, ৯ আর ১ নম্বরে ঠেলে দিতেই খড়াৎ শব্দ করে ম্যাজিকের মতো তালাটা খুলে গেল। মণিবাবু বললেন, 'বন্ধ করাটা আরও সহজ। তালাটা লাগিয়ে যে-কোনও একটা হুক নম্বর থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক্।'

আমরা তিনজন রাধারমণ সমাদ্দারের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা বেশ বড়। তাতে মণিবাবু যা যা বলেছিলেন সবই আছে, কিন্তু বাজনা যে এতরকম আছে সেটা ভাবতেই পারিনি। তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা লম্বা শেলফের তিনটে তাকের উপর, কিছু পুবদিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর, কিছু ঝুলছে দেয়ালের হুক থেকে, আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের উপর। এ ছাড়া ঘরে যা আছে তা হল খাট, খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল, উত্তর দিকের দেয়ালের সামনে একটা আলমারি। আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক। খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্কও চোখে পড়ল।

ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকটা দেখে নিল। তারপর আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভিতরে বেশ ভাল করে হাত আর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল, খাটের তোষকের নীচে দেখল, খাটের নীচে দেখল, ট্রাঙ্কের ভিতর দেখল (তাতে একজোড়া পুরনো জুতো আর একটা ছেড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছু নেই)। তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে নেড়ে চেড়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা ফেলা অংশে চাবির গর্ত আছে কি না দেখে আবার ঠিক যেমনভাব রাখা ছিল তেমনিভাবে রেখে দিল। তারপর ঘরের মেঝে আর দেয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গট দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল। সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার লাগল পনেরো মিনিট। তারপর আরও সাত মিনিট লাগল অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে। সবশেষে আবার রাধারমণবাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল, 'মণিমোহনবাবু, আপনাদের মালীটিকে একবার ডাকুন তো।'

মালী এলে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানালায় রাখা দুটো ফুলের টব থেকে মাটি বার করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে আবার মাটি ভরিয়ে ফুল সমেত টব জানালায় রাখল।

এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার উপর লেবুর সরবত রেখে গেছে। সরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন, 'কিছু বুঝলেন?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'এতগুলো বাজনা এক সঙ্গে না থাকলে এঘরে যে কোনও অবস্থাপন্ন লোক বাস করত সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হত।' ।

'সেই তো বলছি', মণিবাবু বললেন, 'সাধে কি আপনাকে ডেকেছি! আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই। '

আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম। তার মধ্যে সেতার সরোদ তানপুরা এসরাজ তবলা বাঁশি–এগুলো আমি চিনি। অন্যগুলো আমি কখনও চোখেই দেখিনি। ফেলুদাও দেখেছে কি না সন্দেহ। সে মণিবাবুকে প্রশ্ন করল, 'সব কটা বাজনার নাম জানেন? ওই যে দেয়াল থেকে তারের যন্ত্রটা ঝুলছে, ওটার কী নাম?'

মণিবাবু হেসে বললেন, 'আমি মশাই এক্কেবারে বেসুরে। আমাকে ও সব জিজ্ঞেস করলে কিন্তু ফাঁপরে পড়ব।'

একটা পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি সেই বন্দুকওয়ালা ছেলেটির সঙ্গে বছর চল্লিশের একজন ফরসা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন। মণিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনিই হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনী সেন। ছেলেটির নাম হল সাধন। অবনীবাবু প্রদোষ মিত্তিরের নাম শুনেছেন জেনে ফেলুদা একটা ছোট্ট একপেশে হাসির সঙ্গে একটা গলা খাক্রানি দিল। অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মণিবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'ভাল কথা, আপনার কাকা কি কাউকে তাঁর কোনও বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন?'

'কই না তো ! মণিবাবু অবাক।'

'কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন। এখানে কাউকে না পেয়ে আমার বাড়িতে যান। আমি তাঁকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি। আমি আন্দাজ করেছিলাম আপনি হয়তো আসতে পারেন। ভদ্রলোকের নাম সুরজিৎ দাশগুপ্ত। আপনার কাকার মতোই বাজনা সংগ্রহের বাতিক। রাধারমণবাবুর লেখা একটি চিঠি দেখালেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগেই

লেখা ! সেই চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক নাকি আগেই একবার দেখা করে গেছেন। আপনাদের চাকরও তাকে দেখেছে বলে বলল।’

‘আমিও দেখেছি।’

কথাটা বলল সাধন। সে একটা টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমেনিয়ামের মতো একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পদার উপর আস্তে আস্তে আঙুল টিপে টুং টাং সুর বার করছে।

অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন, ‘সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে। দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল।’

‘দাদুকে কেমন লাগত তোমার?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘মাঝে মাঝে খারাপ।’ সাধন আমাদের দিকে পিছন ফিরেই উত্তরটা দিল।

‘খারাপ কেন?’ ফেলুদা আবার প্রশ্ন করল।

‘খালি খালি সারেগামা গাইতে বলতেন।’

‘আর তুমি গাইতে না?’

‘না। কিন্তু আমি গাইতে পারি।’

‘যত রাজ্যের হিন্দি ফিল্মের গান,’ হেসে বলে উঠলেন অবনীবাবু।

‘দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পারো?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘হ্যাঁ।’

‘ তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি?’

'না।'

'তা হলে কী করে জানলেন?'

'দাদু বলতেন যার নামে সুর থাকে, তার গলায়ও সুর থাকে।'

কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না, তাই আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ফেলুদা বলল, 'তার মানে?'

'জানি না।'

' তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ?'

'না। বাজনা শুনেছি।'

এই কথাটায় মণিমোহনবাবু যেন বেশ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'সে কী, সাধনবাবু! তুমি ঠিক বলছ? আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন। তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনও?'

'সামনে না। আমি বাইরে ছিলাম, বাগানে। বন্দুক দিয়ে নরকোল মারছিলাম। উনি তখন বাজালেন।'

'অন্য কোনও লোক বাজায়নি তো?' মণিবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আর কেউ ছিল না।'

ফেলুদা বলল, 'অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শুনলে?'

'না। বেশিক্ষণ না।'

ফেলুদা এবার মণিমোহনবাবুকে বলল, ‘একবার আপনার অনুকূলকে ডাকুন তো।’

অনুকূল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়াল। ফেলুদা বলল, ‘তোমার মনিবকে সম্প্রতি কখনও বাজনা বাজাতে শুনেছ?’

অনুকূল ভীষণ কাঁচুমাচু ভাব করে বলল, ‘এজ্ঞে বাবু তো ঘরের ভিতরেই থাকতেন সর্ব্বক্ষণ, তা সে কখন কী করতেন না করতেন...’

‘তোমার সামনে বাজনা বাজাননি কখনও?’

‘এজ্ঞে না।’

‘বাজনার আওয়াজ শুনেছ?’

‘এজ্ঞে তা যেন কয়েকবার..তবে কানে তো ভাল শুনি না...’

‘মারা যাবার আগে একজন অপরিচিত লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কি? যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন?’

‘তা এসেছিলেন বটে; এই ঘরে বসেই কথা বললেন।’

‘প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে?’

‘এজ্ঞে হ্যাঁ। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে।’

‘যেদিন কাকা মারা গেলেন?’ মণিবাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন।

‘এজ্ঞে হ্যাঁ।’

অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে। সে গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, ‘ সে ভদ্দরলোক গেলেন চলে, আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে

তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি কি তেনার যেন হুশ নেই। কয়েকবার 'বাবু বাবু' করে ডেকে যখন সাড়া পেলাম না তখন এনার বাড়িতে গেলাম খবর দিতে অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল। অবনীবাবু বললেন, 'আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি। অবিশ্যি বিশেষ কিছু করার ছিল না।'

একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল ! অনুকুল বাইরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা ঝুলপি, ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক। জানা গেল ইনিই সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি রাধারমণবাবুর ভাইপো।'

'ও, আই সি। আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয়। উনি আমাকে এসে

দেখা করতে–'

মণিবাবু তার কথার উপরেই বললেন, 'কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি?'

ভদ্রলোক তাঁর কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন। মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুদার হাতে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমণবাবু ভদ্রলোককে রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে নটা থেকে দশটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। কারণটাও বলা আছে – 'বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে। আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন।' উলটোদিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুদা দেখে নিল – মিনাভ হোটেল, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল। চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা।

সুরজিৎবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন। পরের প্রশ্নটাও মণিমোহনবাবুই করলেন।

'আঠারো তারিখে আপনার সঙ্গে কী কথা হয়?'

সুরজিৎবাবু বললেন, 'কিছুদিন আগে একটা পুরনো গীতভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওঁর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমণবাবু সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে এসে ওঁর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি। দাম নিয়ে কথা হয়। আমি দুটোর জন্যে দুহাজার টাকা অফার করি। উনি রাজি হন। আমি তখনই চেক লিখে দিচ্ছিলাম, উনি দুদিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন। তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন। তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই। পরশু ফিরেছি।'

মণিবাবু বললেন, 'আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওঁর শরীর কেমন ছিল?'

'ভালই তো। তবে ওঁর বোধহয় একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দু-একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।'

'আপনার সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি তো?'

প্রশ্নটা শুনে সুরজিৎবাবুর মুখ কয়েক মুহুর্তের জন্য বেশ কালো হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন?'

মণিবাবুও যথাসম্ভব ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না। তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই...'

'তা হতে পারে, তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। এনিওয়ে, আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয় একটা ডিসিশন নিতে পারবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি - দুহাজার - ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন - যন্ত্র দুটো আজ

পেলে ভাল হত। আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি। আমি থাকি ওখানেই। ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি।'

'কোন দুটাে যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি?'

সুরজিৎবাবু খাট থেকে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'একটা হল এটা। এর নাম খামাঞ্চে – ইরানের যন্ত্র। এটার নাম জানতাম, কিন্তু দেখিনি কখনও। বেশ পুরনো যন্ত্র। আর অন্যটা হল –'

সুরজিৎবাবু ঘরের উলটাে দিকে একটা নিচু টেবিলের উপর রাখা ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজাচ্ছিল। ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটার নাম মেলোকর্ড। এটা বিলিতি যন্ত্র; আগে দেখিনি কখনও। আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। খুব সিম্প্রল যন্ত্র; তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফার করেছিলাম। উনি তখন রাজিই হয়েছিলেন –'

'ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাশগুপ্ত।'

সুরজিৎবাবু থমকে গেলেন। কথাটা বলেছে ফেলুদা, আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হানা'র কথাটা কোন বইয়ে যেন পড়েছি। সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাঁই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে শুকনো ভার গলায় বললেন, 'আপনি কে?'

উত্তর দিলেন মণিবাবু।

'উনি আমার বন্ধু। তবে উনি ঠিকই বলেছেন। ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না। তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত। কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই।'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলে গট্‌গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামাঞ্চে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল। রাস্তায় যে খেলার বেহালা বিক্রি হয়, অনেকটা সেই রকম দেখতে। যদিও তার চেয়ে অনেক বড়, আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা।

এবার খামাঞ্চে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পদায় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং টাং শব্দ।

‘এই বাজনার আওয়াজ শুনেছিলে কি?’ ফেলুদা সাধনকে জিজ্ঞেস করল।

‘হতে পারে।’

সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।

এবার ফেলুদা আলমারির দেরাজ থেকে এক তাড়া পুরনো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল, ‘এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি?’

মণিবাবু বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আরও যদি কিছু...’

‘না, আর কিছু দরকার নেই।’

আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুন গুন করছে।

সেটা কিন্তু কোনও ফিল্মের গানের সুর নয়।

# সমাদ্দারের চাবি – ৩

ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দুদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল। চাইতেই হবে, কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও চাবি, বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনও বাক্স বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। তাই ফেলুদা বলল, এক নম্বর, ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে; দুই নম্বর, রাধারমণবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে লোকটা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় কি না দেখতে হবে, আর তিন নম্বর, গান বাজনা সম্বন্ধে আরেকটু ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন, 'কী রকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্যমনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনাকে কতগুলো সন তারিখের ব্যাপারে একটু হেলপ করতে হবে।'

'বলুন।'

'আপনার খুড়তুতো দাদা – অথাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে মুরলীধর – কবে মারা গেছেন?'

'ফিটি ফাইভে। আটাশ বছর আগে।'

'তখন তাঁর ছেলের বয়স কত ছিল?'

'ধরণীর? ধরণীর বয়স ছিল সাত কিংবা আট।'

'ওরা কলকাতাতেই থাকত?'

‘না। দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন। উনি মারা যাবার পর বউদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন। তখন বাবা ছিলেন অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে। অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটেই বউদি মারা যান। ধরণী তখন সিটি কলেজে পড়ছে। মা মারা যাবার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায়। সে পড়াশুনো ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। আর তার বছরখানেক পরে কাকাও চলে গেলেন বামুনগাছি। ওঁর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল –’

‘ফিফটি-নাইনে। গেটের গায়ে ডেট লেখা রয়েছে।’

রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি, কিছু ক্যাশ মেমো, দুটো ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপশন, স্পীগ্‌লার নামে একটা জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ – তাতে নানারকম বাজনার ছবি ও দাম—-খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি, খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ে কাটা পাঁচটা নাটকের সমালোচনা – সেগুলোতে সঞ্জয় লাহিড়ী বলে একজন অভিনেতার প্রশংসা নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা।

এর মধ্যে তিনটি জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল। স্বরলিপিগুলো দেখে বলল, ‘সুরজিৎবাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন, তার হাতের লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে।’ ক্যাটালগটা দেখে বলল, ‘মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না।’ আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল, যদ্দূর মনে হচ্ছে, এই সঞ্জয় লাহিড়ী আর ধরণীধর সমাদ্দার একই লোক। আর তাই যদি হয় তা হলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু।’

কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের পত্রিকা ‘মঞ্চলোক’-এ টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিড়ী কোন যাত্রার দলে আছে জিজ্ঞেস করল। জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপেরা। সেখানে সঞ্জয় লাহিড়ী হিরোর পার্ট করে। তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হল জলপাইগুড়ি

ট্যুরে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে আরও দিন সাতেক। এ খবরটা অবিশ্যি মণিবাবু আগেই দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা বেরোলাম। একদিনে একসঙ্গে এতরকম জায়গায় অনেকদিন যাইনি। প্রথমে জাদুঘর। কেন যাচ্ছি আগে থেকে জানি না, কারণ ফেলুদার এখন মৌনীপর্ব। তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে। বোঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে, তাই ডিসটর্ব করা চলবে না। জাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না। অবিশ্যি সবই দিশি বাজনা - একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত। শুধু বীণাই যে এতরকম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

এর পরে বিলিতি বাজনার দোকান। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সালদানহা কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কখনও শোনেনি। সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে। লালবাজারের মণ্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশমেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্তরের মধ্যে ছিল, তাই বোধহয় ফেলুদা সেখানে গেল। দোকানের মালিক একেবারে জহর রায়ের মতো দেখতে। বললেন, ‘সমাদ্দার মশাই আমাদের অনেকদিনের খদ্দের। সেই আমার ফাদারের টাইম থেকে।’

‘মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম শুনেছেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘মেলোকর্ড? কই, না তো। ক্ল্যারিয়োনেট টাইপের কিছু? ফু দেওয়া যন্ত্র? উইন্ড ইনষ্ট্রমেন্ট?’

ফেলুদা বলল, না। বলতে পারেন হরমোনিয়াম টাইপের। সাইজে অনেক ছোট।। আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি।’

‘ছোট সাইজের বাজনা? তাতে কটা অকটেভ পাচ্ছেন আপনি?

আমি জানি যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা – এই আটটা সুরে মিলে একটা অকটেভ হয়। মণ্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়ামে দেখছি তিন অকটেভের বেশি পদ রয়েছে। মেলোকর্ডে মাত্র একটা অকটেভ রয়েছে শুনে মণ্ডল মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই। এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা-টেলনা ধরনের কিছু হবে। আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন।'

এর পরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্তের দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সংগীতের বই কিনল। তারপর সেখান থেকে বিধান সরণিতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিড়ীর একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল। দাম দিতে হবে কি না জিজ্ঞেস করতে সম্পাদক প্রতুল হাজরা জিভ কেটে বলল, 'দামের কথা কী বলছেন। আপনি ফেলুমিত্তির না?'

রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠাণ্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। এসে দেখি পাড়া ঘুরঘুট্টি, লোড-শেডিং চলছে। ফেলুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বলিয়ে গানের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। ন'টায় আলো আসার পর বলল, 'তোপসে – তুই শ্রীনাথকে নিয়ে চট করে একবারটি পটুদের বাড়ি চলে যা তো–গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্যে হারমোনিয়ামটা চেয়েছে।'

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যা প্যা করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা, আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো। ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উলটো দিকে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে আমি, ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছেন আর সুর করে বলছেন, এইট টু নাইন ওয়ান – 'এইট টু নাইন ওয়ান – এইট টু নাইট ওয়ান?'

# সমাদ্দারের চাবি – ৪

পরদিন মঙ্গলবার। মণিমোহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর নেবেন, কিন্তু সকাল সাতটায় তাঁর টেলিফোন এসে হাজির। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম; ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলতে বললেন, 'দরকার নেই। তুমি ওঁকে বলে আমি এক্ষুনি আসছি, জরুরি কথা আছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন। বললেন, 'অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগে বামুনগাছি থেকে ফোন করছিলেন। কাকার শোবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল।'

ওই জার্মান তালার সংকেত আর কে জানে?' ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

'আমার ভাইপো জানত। অবনীবাবু জানেন কি না জানি না। বোধহয় না। তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি সে লোক।'

'তবে?'

বাথরুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে।'

'কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন তো সে দরজা বন্ধ ছিল। আমি নিজে দেখেছি।'

' পরে হয়তো কেউ খুলেছিল। যাই হোক – কিছু নিতে পারেনি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেসল।...আপনি এখন ফ্রি আছেন? একবার যেতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে। রাধারমণবাবুর নাতিকে – অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধরকে - এখন দেখলে চিনতে পারবেন?' মণিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই, তবু হাজার হোক ভাইপো তো!'

ফেলুদা তার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মণিমোহনবাবুকে দিল। মঞ্চলোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিড়ীর ছবি, তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে একজোড়া গোঁফ আর একটা মোটা ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে।

মণিবাৰু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে, এ যে দেখছি - '

'সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেবল নাকের কাছটায় একটু...'

'যাই হোক, মিল একটা আছে। এটা আসলে আপনার ভাইপোরই ছবি, আমি কেবল একটু রং চড়িয়েছি।'

' আশ্চর্য।...আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয়। ইন ফ্যাক্ট, কাল রাত্রে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি। কিন্তু প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, ফিরতে অনেক রাত হল, তাই আর বলা হয়নি। অবিশ্যি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভবও হত না। ধরণীকে গত পনেরো বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে। থিয়েটারেও না, কারণ ও বাতিকটা আমার একদম নেই; আর যাত্রা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তা হলে তো...'

'তা হলে দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হয়। এক - সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই, দুই - সঞ্জয় লাহিড়ী যাত্রার দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে, এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই। তোপসে – মিনার্ভা হোটেলের নম্বরটা বার কর তো।'

হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেল তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

মডার্ন অপেরায় ফোন করে লাভ নেই, কারণ কালকেই তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিড়ী ট্যুরে গেছে।

বামুনগাছি পৌঁছিয়ে ফেলুদা প্রথমে পাচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল। যেই আসুক, তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে। আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাঁচিল টপকাতে হয়েছে। শেষের কাজটা কঠিন নয়, কারণ তিন জায়গায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে, আর সে গাছের নিচু ডাল পাচিলের উপর দিয়ে কম্পাউন্ডের ভিতর ঢুকেছে। মুশকিল হচ্ছে কী, বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত, কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো।

অনুকূলের শরীর ভাল নয়। সে তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কুঁই-কুঁই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথার যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাত্রে তার ভাল ঘুম হচ্ছিল না। সে যেখানে শোয় সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানালা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানালা দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধড়মড়িয়ে উঠে কে কে বলে হাক দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু সে পৌছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে।

‘অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পারনি বোধহয়?’ মণিবাবু প্রশ্ন করলেন।

‘না বাবু। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখি না, আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা...’

রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্তর যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাও ফেলুদার গম্ভীর গলার স্বরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

'মণিবাবু, বারাসত থানায় খবর দিতে হবে। এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে লোক আবার আসতে পারে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিড়ী নাও হন, তা হলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে, কারণ ওই দুটাে যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট লোভ। পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব না হলে অন্য উপায়ে ওগুলো হত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। এই সব কালেক্টরদের গোঁ বড় সাংঘাতিক।'

মণিবাবু বললেন, 'আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ও-সির সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা মেলোকর্ডটাকে নিয়ে খাটের ওপর বসে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। দারুণ মজবুত তৈরি, দুপাশের কাঠে সুন্দর কাজ করা। জিনিসটাকে চিত করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়া লেবেল দেখা গেল। ফেলুদা চোখ কুঁচকে লেখাটা পড়ে বলল, 'স্পীগলার কোম্পানির তৈরি। মেড ইন জার্মানি।'

ফেলুদা হরমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই, কিন্তু কাঁচা হাতে একটা একটা করে পর্দা টিপে যখন জনগণমন-র খানিকটা মেলোকর্ডে বাজাল, তখন যন্ত্রটার গুণে সেটা শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'একবার ইচ্ছে করে জিনিসটাকে ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখি; কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তা হলে বাজনাটার জন্য আপশোস হবে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক হাজার টাকা অফার করছিল এটার জন্যে।'

অনুকূল এই শরীর নিয়েও সরবত করে এনেছিল, সেটায় চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন, 'থানায় বলে দিয়েছি। দুজন লোক থাকবে সন্ধ্যা থেকে। অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না; সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। ফিরবেন বিকেলে।'

ফেলুদা বলল, 'রাধারমণবাবুর টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে?'

মণিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে। টাকা যে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে সেটা অবিশ্যি অবনীবাবু জানেন, কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানার কথা নয়। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি আসলে ধরণীধর হয়ে থাকে, তা হলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে। আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল। তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, তার ফলে...'

মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না।

ফেলুদা তাঁর দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে বলল, তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয়। আর সেই অবস্থাতেই ধরণীধর ঘরের মধ্যে টাকার অনুসন্ধান করে। আপনি এই ভাবছেন তো?'

' হুঁ...কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি।'

'যদি পেত তা হলে সে বাজনা কেনার অজুহাতে আবার ফিরে আসত না – এই তো?'

'ঠিক তাই। তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে।'

'মেলোকর্ড।'

মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

'আপনি তাই বলছেন?'

'আমার মন তাই বলছে,' ফেলুদা বলল। 'তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না। আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলোও আমি ভুলতে পারছি না। আপনার শুনতে কোনও ভুল হয়নি তো? উনি "চাবি" কথাটাই বলেছিলেন তো?'

মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'কী জানি মশাই, চাবি বলেই তো মনে হল। অবিশ্যি..এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ বকছিলেন। চাবি কথাটার হয়তো কোনও অর্থ নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দমবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না; ও বলল, 'প্রলাপই হোক আর যাই হোক, এ ঘরে টাকা আছে। আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি। চাবিটা আসল কথা নয়। আসল কথা টাকা।'

'তা হলে আপাতত কী করবেন সেটা ঠিক করুন।'

'করেছি। আপাতত বাড়ি ফিরব। দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনও লোককে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। রাত্রে তো পাহারাই থাকবে। আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিন্তা করব। একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার। তবে একটা কথা, তেমন বুঝলে আজ রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি।'

'ভাল কথা – আপনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করেন?'

'সংখ্যাতত্ত্ব?' মণিমোহন ভাবাচ্যাকা।

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, আপনাদের সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অক্ষরের – রাধারমণ, মুরলীধর, ধরণীধর, মণিমোহন – তাই প্রশ্নটা মনে এল।'

# সমাদ্দারের চাবি – ৫

‘আগে লেখ– মৃত ব্যক্তির নাম কী ছিল।’

ফেলুদা তার খাটে বসে আছে, আমি তার পাশের চেয়ারে। আমার হাতে সে খাতা পেনসিল ধরিয়ে দিয়েছে। আমি লিখলাম–

‘রাধারমণ সমাদ্দার।’

‘তার নাতির নাম?

‘ধরণীধর সমাদ্দার।’

‘নাতির থিয়েটারি নাম?’

‘সঞ্জয় লাহিড়ী।’

‘দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম?’

‘সুরজিৎ দাশগুপ্ত ‘ ‘

‘রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম?

‘অবনী সেন।’

‘ তার ছেলের নাম?’

‘সাধন সেন।’

'রাধারমণের শেষ কথা কী ছিল?

'আমার নামে...চাবি...চাবি...'

'গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত কটা সুর থাকে?'

এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সংগীত প্রবেশিকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি না। যাই হোক, আমি লিখলাম–

'বারোটা।'

'কী কী?'

'সাতটা শুদ্ধ, চারটে কোমল, একটা কড়ি।'

'শুদ্ধ সুর কী কী? কীভাবে লেখে?'

' স র গম প ধ ন। '

'কোন-কোনটা কোমল হয়?'

' র গ ধ ন। '

'কীভাবে লেখে?

'ঋ জ্ঞ দ ণ।'

'আর কড়ি?

' ম্‌া '

'কীভাবে লেখে?

‘হ্যাঁ।’

‘এবার দে কাগজটা।’

দিলাম।

‘এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস। দরজাটা ভেজিয়ে দে। আমি কাজ করব।’

গেলাম বৈঠকখানায়। দরজা ভেজালাম। সোফায় বসলাম। চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি, আবার পড়তে শুরু করলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম। কৌতুহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম। ফেলুদার গলা পেলাম, ‘ডাক্তার বোস আছেন, চিন্তামণি বোস?’

ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করছে, যাকে মনিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাকাকে দেখাতে।

ফোনটা কাকে করছে সেটাই জানতে চাইছিলাম, বাকি কথা শোনার দরকার নেই। আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম।

দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ। ডায়ালিং- এর।

উঠে দরজায় গেলাম কান লাগালাম।

‘ইউরেকা প্রেস? কে কথা বলছেন?’

মণিমোহনবাবুর প্রেস। ব্যাস্ - এইটুকুই যথেষ্ট। আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম।

চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল, তখনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না। শেষে যখন দেয়াল ঘড়িতে দেখি চারটে পঁয়ত্রিশ, আর আমি ভাবছি আমার ওই কটা লেখা নিয়ে ফেলুদা অত কী ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ও দরজা খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'মাথা ভোঁ ভোঁ করছে রে তোপসে, একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মরার মুখে বলা সামান্য তিনটে কথার মানে নিয়ে এত কেন ভাবতে হল সেটা ভেবে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এর জন্যে অবিশ্যি দায়ী আমাদের বাংলা ভাষা...' .

আমি অবিশ্যি ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, আর বুঝতে পারছি যে, যে আবছা আলোটার কথা ও বলছিল সেটা ওর কাছে আর আবছা নেই।

'সা ধা নি সা নি...সব কটা শুদ্ধ সুর। শুনে কিছু মনে পড়ছে? কোনও মানে বুঝতে পারছিস?'

আমার মাথা আরও গুলিয়ে গেল। ফেলুদা বলল, 'তোর বুঝতে পারার কথা নয়। পারলে তোতে আর ফেলু মিত্তিরে কোনও তফাত থাকত না।'

ভাগ্যিস তফাতটা আছে ! আমি ফেলুদার স্যাটিলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না।

ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মারার মতো করে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানার টেলিফোনে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। দশ সেকেন্ড পরেই কথা।

'কে – মিস্টার সমাদ্দার? চলে আসুন – এক্ষুনি – বামুনগাছি যেতে হবে – হ্যাঁ, হয়ে গেছে – সব পরিষ্কার...মেলোকর্ড...হ্যাঁ, মেলোকর্ডই আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি।'

তারপর টেলিফোনটা রেখে গভীর গলায় বলল, একটা রিস্ক আছে রে তোপসে, কিন্তু সেটা না নিলেই নয়।'

মণিবাবুর ড্রাইভার গুরুচরণ দেখতে বুড়ো হলেও ভি আই পি রোডে পঁচাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড তুলল। ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল হ্যান্ড্রেড-টান্ড্রেড হলে সে আরও খুশি হত। এয়ারপোর্টের পর খানিকটা রাস্তা লোকজনের ভিড়ে স্পিড অনেক কমল, কিন্তু পরের দিকে আবার ষাটে উঠল – যদিও রাস্তা তত চওড়া নয়, আর সন্ধেও হয়ে আসছে।

রাধারমণবাবুর গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, ' পাহারার লোক আসার সময় হয়নি বোধহয় এখনও।'

গেট দিয়ে ঢুকতেই বাগানে দেখলাম বন্দুক হাতে সাধন দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল, 'কী সাধনবাবু, এই সন্ধের আলোতে কী শিকার হচ্ছে?

সাধন বলল, 'বাদুড়।'

রাধারমণবাবুর কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে কয়েকটা বাদুড় ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নেমেই আমার চোখে পড়েছিল।

অনুকূল গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল; মণিবাবু তাকে লণ্ঠন জ্বালতে বলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন, আর আমরাও ঢুকলাম তাঁর পিছন পিছন। এইট-টু-নাইন-ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মণিবাবু বললেন, 'রহস্যের কীভাবে সমাধান হল সেটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে।' আসলে ফেলুদা সারা রাস্তা কোনও কথা বলেনি, কাজেই মণিবাবুর যা অবস্থা, আমারও তাই।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফেলুদা তার ভীষণ জোরালো টর্চটা ঘরে পশ্চিমের দেয়ালের নীচের দিকে ফেলল। আমার বুক টিপ টিপ করছে। আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলে রাখা

মেলোকর্ডের উপর পড়েছে। ঝকঝকে সাদা পদগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত বের করে হাসছে। ফেলুদা টর্চটা সেইভাবেই ধরে রেখে বলল –

'চাবি। ইংরিজিতে Key, বাংলায় চাবি। এই যে সাদা-কালো পদাগুলো দেখছিস, ওর আর একটা নাম হল চাবি, আর সেই চাবির কথাই–'

চোখের পলকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেটা ভাবতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মণিবাবু হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে মেলোকর্ডটাকে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ফেলুদার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা মার খাবার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য টর্চ সমেত হাত দুটাে মাথার উপর তুলেছিল। তাই হয়তো তার মাথায় চোট লাগেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতের যন্ত্রণাতেই সে দেখি খাটে বসে পড়েছে। আমি নিজে মেঝে থেকে উঠতে না উঠতেই বুঝলাম মণিবাবু বাইরে থেকে এইট-টু-নাইন-ওয়ান বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজায় একটা ধাক্কা মেরেছি, এমন সময় ফেলুদার গলী পেলাম – 'বাথরুম!'

বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ, আর তারপরেই ঠাঁই করে একটা আওয়াজ। আমরা দুজনে ঝড়ের মতো বাথরুমে ঢুকে জমাদারের দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাগানের দিক থেকে গোলমাল, অনুকূলের গলা, অবনীবাবুর গলা। মণিবাবুর গাড়িটা বাঁই করে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল! আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি।

ওটা কে বসে আছে কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর? অবনীবাবু চেঁচাচ্ছেন – 'তুমি কী করলে, সাধন। এটা কী করলে তুমি ! ছি-ছি-ছি !'

সাধন তার সরু অথচ গম্ভীর গলায় বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, ‘ও যে দাদুর বাজনা নিয়ে পালাচ্ছিল!’

এবার ফেলুদা বলল, ‘ও ঠিকই করেছে, অবনীবাবু ! অপরাধীকে এয়ারগান দিয়ে পঙ্গু করে ও আমাদের সাহায্যই করেছে – যদিও ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানে বন্দুক চালাতে হবে। ..আপনি এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিন। গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয় – ওর নম্বর হল ডব্লুএম এ সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর।’

অনুকূল আর ফেলুদা দুজনে মিলে মণিবাবুকে ধরে তুলল। তাঁর কপালের বা দিক থেকে ছররার গুলি লেগে রক্ত পড়ছে। ভদ্রলোক একেবারে থুম মেরে গেছেন।

মেলোকর্ডটা মণিবাবুর পাশেই কাঁকরের উপর পড়ে ছিল, আমি সেটাকে খুব সাবধানে তুলে নিলাম।

আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি। চারজন মানে আমি, ফেলুদা, অবনীবাবু, আর বারাসত থানার দীনেশ গুঁই, ইনি বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর হবেন। ঘরের এক কোণে সিন্দুকটার সামনে আরও দুজন লোক রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে, সে বোধহয় কনস্টেবল, আর আরেকজন চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে। ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমাদ্দার, যার কপালে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা। এ ছাড়া সাধনও রয়েছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে দেখছে। আমাদের পাঁচজনের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে মেলোকর্ড। এইবার বোধহয় ফেলুদা একটা রহস্য উদঘাটন করবে। ফেলুদার ঘড়ির কাচ ভেঙে গেছে, আর বা হাতের কবজির খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে ডেটল নিয়ে লাগিয়ে সেখানে সে রুমাল বেঁধে রেখেছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল – ‘মণিমোহন সমাদ্দারকে আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করি আজ দুপুর থেকে। কিন্তু তিনি

কোনও একটা বেচাল না চাললে তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছিল না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব। আমি তাই খানিকটা রিস্ক নিয়েই তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম। আমাকে আচমকা আক্রমণ করে বাজনা নিয়ে পালানোটাই হল তাঁর ভুল চাল। শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি সায়েস্তা হলেন তার জন্য অবিশ্যি দায়ী সাধনের এয়ারগান।

'মণিমোহনবাবুর একটা কথায় প্রথম খটকা লাগে। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন লাগেনি, পরে লাগে। উনি বলেছিলেন পরশু ওঁর প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, তাই ওঁর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। পরশু ছিল সোমবার। আমি জানি যে-পাড়ায় মণিবাবুর প্রেস, সে-পাড়ায় সন্ধ্যায় নিয়মিত লোড-শেডিং হয়; আমার এক প্রোফেসর বন্ধু সেই একই পাড়ায় থাকে। আজ ইউরেকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত, সোমবার বিকেল থেকে লোড-শেডিং-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল, আর দ্বিতীয়ত, মণিমোহনবাবু দুপুরের পর আর সেদিন প্রেসেই যাননি। এই মিথ্যে কথাটাতেই আমার মনে ভীষণ খটকা লাগে। আর তার পরেই সন্দেহ হয় – উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সত্যি তো? রাধারমণের মৃত্যুর সময় মণিবাবু ছাড়াও একজন লোক সেখানে ছিলেন। তিনি হলেন ডাক্তার চিন্তামণি বোস। তাঁকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিবাবু পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি – রাধারমণের একটা কথা তিনি গোপন করেছিলেন। রাধারমণ আসলে বলেছিলেন – "ধরণী...আমার নামে...চাবি...চাবি....'। ধরণী হল রাধারমণবাবুর নাতি। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁর নাতিকেই কিছু বলার কথা মনে এসেছিল, ভাইপোকে নয়। ভাইপোকে হয়তো সেই অবস্থায় তিনি চিনতেই পারেননি। আসলে নাতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমণবাবুর স্নেহ যায়নি। তার অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন। কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তাঁর ভাইপো। চাবি কথাটা শুনে মণিমোহন বুঝলেন যে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শেষটায় চাবি দিয়ে কিছুই বেরোল না। তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা ফেলুমিত্তিরের কাছে আসতে হল। মতলব এই যে আমি টাকার সন্ধান দেব, আর উনি সুযোগ বুঝে সেটি

আত্মসাৎ করবেন। উইল আছে কি না জানা নেই। না থাকলে টাকা নাতি পাবে। আর থাকলেও মণিবাবুর পাবার সম্ভাবনা কম, কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমণবাবু তাঁর ভাইপোকে পছন্দ করতেন না।

'এখন কথা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল। তাঁর মাথায় কি সেদিন কোনও ক্রুর অভিসন্ধি খেলছিল, যে কারণে তাঁর পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি? সেইদিনই মাঝরাত্রে যে-লোক রাধারমণবাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তা হলে মণিমোহন সমাদ্দার? এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ সেদিনই সকলে আমি যখন রাধারমণবাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি, তখন জমাদারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সে দরজা খুলবে কে, এবং কেন? বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না। আসলে যে লোক ঢুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জামান তালা খুলে ঢুকেছে, সে তালার সংকেত তার জানা, ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জামান তালা বন্ধ করে, আবার বাথরুম দিয়ে ঢুকেছে। এই লোক যে মণিমোহন সমাদ্দার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বোধহয় বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলোকর্ড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন, তাই না?'

আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেল। মাথা হেঁট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দুবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা বলল, 'চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুঝলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমণের বাকি সংকেতটা ধরতে পারেনি। কারণ অতটা বুদ্ধি ওঁর নেই। এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকেলে, আর সেটার জন্যেও দায়ী শ্রীমান সাধন।'

এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম। সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'তোমার দাদু সুরের বিষয় কী বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন। '

সাধন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'যার নামে সুর থাকে, তার গলাতেও সুর থাকে।'

ফেলুদা বলল, 'ভেরি গুড়। এবার রাধারমণবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা ক্রমে বোঝা যাবে। যার নামে সুর থাকে। বেশ। সাধনের নামটাই ধরা যাক। সাধন সেন। এবার অ-কার এ-কার বাদ দিয়ে কী দাঁড়ায় দেখা যাক স, ধ, ন, স, ন। অথাৎ গানের সুরের ভাষায় সাধা নিসা নি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল।"আমার নামে...চাবি।" রাধারমণবাবু কি এখানে নিজের নামের কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন? রাধারমণ সমাদ্দার রে ধা রে মানি স মা দা দা রে! কী সহজ, অথচ কী ক্লেভার, কী চতুর! ধরণীধরও কিন্তু গাইতে পারত, আর তার নামেও দেখছি সুর – ধা রে ণি ধা রে সা মা দা দা রে !

'এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম যে ওই মেলোকর্ডেই রাধারমণের ব্যাঙ্ক যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে রাধারমণবাবুর যে একটা ঝোঁক ছিল সেটা ওই জার্মান তালা থেকে বোঝা যায়। এই মেলোকর্ডও জার্মানিতেই তৈরি। স্পীগলার কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতকারক রাধারমণবাবুর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলোকর্ড তৈরি করে। কী ভাগ্যিস এটি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে চলে যায়নি। অবিশ্যি যন্ত্র দেবার আগে রাধারমণ তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিতেন। বোধহয় ব্যাঙ্কের আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি। হয়তো তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন। সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ করছিলাম, ভাবছিলাম উনি ছদ্মবেশী ধরণীধর। আসলে সুরজিৎবাবু সত্যিই একজন বাজনা পাগল সংগীতজ্ঞ লোক। তার উল্লেখ আমি গানের বইয়েতে পেয়েছি। আর ধরণীধর সত্যিই তার যাত্রার দলের সঙ্গে ট্যুরে বেরিয়েছে। এখন জানা দরকার যে তার ভাগ্যে সত্যিই কোনও অর্থপ্রাপ্তি আছে কি না। তার অনেক দিন থেকেই একটা নিজের যাত্রা দল করার ইচ্ছে; মঞ্চলোকের একটা ইন্টারভিউতে সে তাই বলেছে। তোপসে – লণ্ঠনটা কাছে এনে ধর তো।'

আমি লণ্ঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের পাশে এনে ধরলাম।

ফেলুদা বলল, ‘ অনেক ধকল গেছে এটার উপর দিয়ে। তবে জার্মান জিনিস তো – দেখা যাক রাধারমণের বুদ্ধি আর পীগলার কোম্পানির কারিগরি মিলে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে।’

রাধারমণ সমাদ্দারের নামের অক্ষর ধরে ধরে ফেলুদা চাবি টিপতে আরম্ভ করে দিল। টুং টাং টুং টাং করে একটা অদ্ভুত সুর বেরোচ্ছে মেলোকর্ড থেকে। শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকর্ডের ডান পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গেল। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে লাল মখমলের লাইনিং দেওয়া একটা খুপরি, আর সেই খুপরিতে ঠাসা রয়েছে তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট।

নোটগুলো টেনে বার করে ফেলুদা বলল, কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। আসুন অবনীবাবু, গোনা যাক।

ফেলুদার চোখ লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আমি জানি সেটা লোভ নয়। সেটা তার শান দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে মনধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ।